ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে নগরজীবন

*মোঃ রুহুল আমিন

সারসংক্ষেপ: বন্দে আলী মিয়া প্রধানত কবি, তবে উপন্যাস রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন বলে জানা যায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নগরভিত্তিক। তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা ও ঢাকা নগরের বহুমাত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে; বিশেষভাবে নাগরিক জীবন ও প্রাত্যহিকতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা, ধর্মাচরণ, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্ক প্রভৃতি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে নগরজীবনের ভেতর-বাহির অবলোকন করেছেন। সমকালীন বাঙালি নাগরিক জীবনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে বন্দে আলী মিয়ার উপনাসে। আলোচ্য প্রবন্ধে ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট বিচিত্র জীবনধারার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ভূমিকা

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬–১৯৭৯) কবি এবং শিশুসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত, তবে উপন্যাস রচনায় তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর ১৫টি উপন্যাস গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় – যথা: 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (১৯৩১), 'ঘূর্ণি হাওয়া' (১৯৩৪), 'দিবাস্বপ্ন' (১৯৫৪), 'মনের ময়ূর' (১৯৫৬), 'নীড়ভ্রষ্ট', 'অরণ্য গোধূলি' (১৯৬১), 'ঝড়ের সংকেত' (১৯৬১), 'প্রেমের বহ্নিশিখা', 'বয়সের দাবী', 'নারী রহস্যময়ী', 'জাগ্রত যৌবন', 'অস্তাচল', 'অস্তরাগ', 'দিগন্ত বাসর' এবং 'পরিহাস'।[১] উল্লিখিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'দিবাস্বপ্ন', 'মনের ময়ূর' এবং 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাস বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে; অন্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন যে, কলকাতার কাশীদত্ত রোডের বাড়িতে কর্মময় জীবনের যে সঞ্চয় তিনি রেখেছিলেন, তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হয় চুরি গেছে বা কেউ নিয়ে গেছে, না হয় নানাভাবে নষ্ট হয়েছে; ফলে বহু বইয়ের কপি এবং আরো অনেক দলিল চাইলেও আর তিনি দেখাতে পারবেন না।[২]

এই সীমাবদ্ধতার জন্য ঔপন্যাসিক হিসেবে বন্দে আলী মিয়ার মূল্যায়ন অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। প্রাপ্ত পাঁচটি উপন্যাসের মধ্যে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'মনের ময়ূর' এবং 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সমকালীন নগর জীবনের চিত্র বিধৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিক শিক্ষা ও চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন কলকাতা থেকেছেন; দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে ফিরে কিছুদিন ঢাকায় এবং পরে রাজশাহী শহরে বসবাস করেছেন। শহর ও নগরবাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সমকালীন নগরজীবনের শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন। বিশ শতকের বাঙালির, বিশেষ করে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে ধারণ করে তিনি তাঁর সমকালীন নগরজীবনের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। তৎকালীন বাঙালির আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপাখ্যান হিসেবে উপন্যাসগুলোর গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রবন্ধে পাঠ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির আলোকে বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে নগরজীবন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* আইবিএস ফেলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা এং বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

২. উপন্যাসে বিধৃত স্থান ও কাল

বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক তিনটি উপন্যাসে বিশ শতকের দেশ বিভাগপূর্ব কলকাতা এবং বিভাগোত্তর ঢাকা নগরের সমাজজীবন প্রধান হয়ে উঠেছে। মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম, পরিণয় এবং আনন্দ-বেদনাময় দাম্পত্য জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। এ উপন্যাসের কাহিনীতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কলকাতা নগরের ঘটনাবলি প্রাধান্য পেয়েছে। কলকাতার বৃহত্তর নগরসমাজ ও শিল্প-সাহিত্যের পটভূমিতে এক তরুণ শিক্ষকের একের পর এক নারীসঙ্গ লাভের কাহিনী নিয়ে রচিত 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। আর মানবতাবাদকে উপজীব্য করে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ ও নগরজীবনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'অরণ্য গোধূলি'। এ উপন্যাসের কাহিনীর বিস্তার ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকব্যাপী। কেন্দ্রীয় চরিত্র অজয় মুসলমানের সন্তান হয়েও ভাগ্যচক্রে এক নিঃসন্তান হিন্দু দম্পতির পরিচয়ে লালিত-পালিত এবং পরিশেষে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা এবং ঢাকা নগরে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও নব্য ধনিকশ্রেণির আধিপত্য ছিল। তখনকার কলকাতায় ও ঢাকায় ট্রেন-বাস যেমন চলতো, তেমনি চলতো গরুরগাড়ি-ঘোড়ারগাড়ি। এসব নগরে ইটের দালানের পাশে কুঁড়েঘর যেমন ছিল, তেমনি জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও ধনিকশ্রেণির সঙ্গে ছিল গ্রাম থেকে উঠে আসা নিম্নবিত্ত ও নব্য মধ্যবিত্তের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব।[৩] তখন নগর কলকাতা ও ঢাকা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত সত্ত্বেও আজকের মহানগর কলকাতা ও ঢাকার মতো এতটা বর্ণিল এবং বিচিত্র নাগরিক টানাপোড়েনে জর্জরিত ছিল না। বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসে সেই নব্য পুঁজিবাদী ও সামন্তশাসিত নগর-সমাজের বহুমুখী চিত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্প-আঙ্গিক, সেহেতু সমাজজীবনের অন্তর-বাহিরের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের রূপায়ণই তার ধর্ম।[৪] বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে এই বহুমাত্রিক জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কলকাতা নগরভিত্তিক দুটি উপন্যাসের নায়ক ফরিদ এবং আলী চরিত্রে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়েছে। ফরিদের সঙ্গে লেখকের সংগ্রামমুখর শিক্ষাজীবনের এবং আলীর সঙ্গে বর্ণিল কর্মজীবনের মিল রয়েছে। তিনি ফরিদের মতো পূর্ব বাংলার মুসলিম পরিবার থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা গিয়েছিলেন, এবং আলীর মতো এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন; সেইসঙ্গে কবি, নাট্যকার, গীতিকার, কথাসাহিত্যিক এবং চিত্রকর হিসেবে কলকাতার সুধীমহলে পরিচিতি পেয়েছিলেন। অসাম্প্রদায়িক ও বস্তুবাদী জীবনবোধেও ফরিদ ও আলী চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও ঔপন্যাসিক তাঁর চেতনায় যে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী জীবনানুভূতি লালন করতেন, 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসের নায়ক অজয়ের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. সমাজ

ইংরেজদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আশায় উনিশ শতকে চারদিক থেকে লোকজন কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিল।[৫] বিশ শতকেও এই যাত্রা অব্যাহত থাকে। মূলত চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে লোকজন কলকাতায় আসে। ফলে কলকাতা হয়ে ওঠে জনবহুল এবং কর্মব্যস্ত নগরী। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে এই জনস্রোত এবং কর্মব্যস্ত কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক বলেন:

> গাড়ি চলেছে রাজপথে। পথের দু'পাশে চলমান জনতা। এ জনতা প্রতিদিনের– এ জনতা অনাদি কালের। মানবের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার মিছিল– কর্মব্যস্ততার মিছিল– সংগ্রামের মিছিল। কর্মক্লান্ত নর ফিরছে গৃহের পানে– কেহ চলেছে বাহিরে। বিচিত্র কণ্ঠের কল কোলাহল। অপরাহ্নের ম্লান ছায়ায় অপরূপ হয়েছে পরিচিত ধরিত্রী। চলেছে ট্রাম– চলেছে বাস– চলেছে রিক্সা– চলেছে মিলিটারী ভ্যান। ধূলায় ধূসর চারিধার।[৬]

কলকাতায় জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নগরায়ণ। এতে আবাসন ও কলকারখানার জন্য জমির দাম যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি জমি ক্রয়-বিক্রয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দালালশ্রেণি। 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে শিক্ষক আলী এমন এক দালাল শচীন বাবুর মাধ্যমে কলকাতায় দুকাঠা জমি ক্রয় করে ভবিষ্যৎ গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের উপজাত পরিবেশ দূষণের ইঙ্গিত আছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে। কলকাতা শহরতলির ঘিঞ্জি এলাকায় দীর্ঘদিন বাস করে অসুস্থ বোধ করলে বায়ু পরিবর্তনের জন্য ফরিদ পুরীর সমুদ্রতীরে কয়েক মাস অবস্থান করে।

দেশভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয়ে গেলে অভিজাতশ্রেণি এবং শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জৌলুস বাড়তে থাকে।[৭] এ সময়ে পুঁজিবাদের উত্থানের সাথে সাথে ঢাকায় গড়ে উঠতে থাকে আবাসন, দামি হোটেল ও রেস্তোরাঁ। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে ঢাকার এই চিত্র ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে অজিত ও সুমিত্রা সমস্ত বিকেল গাড়িতে ঘুরে সন্ধ্যায় 'হোটেল শাহবাগ' নামক অভিজাত হোটেলে ওঠে। লেখক বলেন, "বৈদ্যুতিক প্রভায় পুরীটি যেন অমরাবতী। ম্যানেজারের ঘরে এসে অজয় একটি কামরা ভাড়া নিলে। একজন ভৃত্য সঙ্গে গিয়ে ঘরটা খুলে আলো জ্বালিয়ে দিলে– পাখাটা খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে: কুচ খানাপিনা হুজুর?"[৮] হোটেলের সামনে একজন ফুল বিক্রেতাকে কয়েক ছড়া মালা ও ফুলের তোড়া নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। অন্যত্র গুলিস্তান রেস্টুরেন্টে খাওয়ার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়– যেখানে মাটন চপ, কাটলেট, ফ্রাই, পুডিং ইত্যাদি প্লেটে সজ্জিত হয়ে টেবিলে হাজির হয়।

বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসে বিধৃত বিশ শতকের প্রথমার্ধে যৌথ ও একক পরিবার প্রথা লক্ষ করা যায়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে মালবিকাদের পরিবার এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে সেন জমিদারদের পরিবার প্রথাগত যৌথ পরিবার। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙন ধরে।

বৈষয়িক স্বার্থসচেতন নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণি বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে একক পরিবার। এ সময় অগ্রসরমান মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যেও একক পরিবার প্রথায় আস্থা পরিলক্ষিত হয়। ঔপন্যাসিকের 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদ, 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে আলী সময় ও সমাজের গতি মেনে একক পরিবার গড়ে তোলে। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে সুমিত্রাদের পরিবারও একক পরিবার।

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে তার উল্লেখ আছে। ফরিদের বন্ধুদের সম্পর্কে লেখক বলেন, "কেহ পড়িতেছে, কেহ ছাড়িয়া দিয়া ছাত্রজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই উপার্জনহীন।"[৯] এ সময়ে মুসলমানরা চাকরির ক্ষেত্রেও বেশ পিছিয়ে ছিল। 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে দেখা যায় কলকাতার কাশীশ্বর চ্যাটার্জী লেনের স্কুলে মোট চৌদ্দ জন শিক্ষকের মধ্যে আলী একমাত্র মুসলমান। অবশ্য কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ থাকলেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবহেতু মুসলিম মেয়েরা তা নিতে ব্যর্থ হয়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা ও ঢাকা নগরে কিছুটা গ্রামীণ আবহ ছিল, তবে অধিকাংশ লোক জীবিকা নির্বাহ করতো চাকরি, ব্যবসায় ও বিনোদনমূলক ক্ষেত্রে কাজ করে।[১০] বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের এসব পেশাজীবী প্রবলভাবে উপস্থিত। এরা উপন্যাসের কাহিনিকেন্দ্রে অবস্থান করে এবং এদের ঘিরে উপন্যাসের ঘটনাবলি আবর্তিত-বিবর্তিত হয়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদ-মালবিকা উভয়ই ডাক্তার, মালবিকার বাবা ব্যবসায়ী, 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে আলী-হেনা উভয়ই শিক্ষক। আর পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে রচিত 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসের নায়ক অজয় ডাক্তার, নায়িকা সুচিত্রা শিক্ষিকা এবং সুচিত্রার বাবা সুব্রত নারায়ণ মুখার্জী প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। ঔপন্যাসিক এসব নাগরিকের পেশাগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে এদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বিশ শতকে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজও মূলত পুরুষতান্ত্রিক ছিল। বৃহত্তর বাঙালি সমাজে তখনো প্রত্যাশা করা হতো নারীরা সন্তান লালনপালন, রান্নাবান্না এবং ঘরের কাজ করবে।[১১] 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদের এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে আলীর মানসিকতায় তা ফুটে উঠেছে। এরা নারীকে পরিপূর্ণা নারী হিসেবে না দেখে লজ্জাশীলা বধূ হিসেবে দেখতে চেয়েছে। এমবিবিএস পরীক্ষায় ফরিদের চেয়ে মালবিকা ভালো ফল করলেও বিয়ের পর ফরিদ তাকে ডাক্তারি করতে দিতে চায়নি; পরে বাধ্য হয়ে রাজি হলেও একদিন মালবিকাকে এক পুরুষ রোগীর পেটে হাত দিতে দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা:

> সে মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র জীবনটা তাহাদের সংস্পর্শে কাটাইয়া দিয়া বিগত বৎসর দুই যাবৎ মালবিকার সহিত একত্রে বাস করিতেছে। তাহার শৈশব এবং বাল্যকালের সংস্কার আপনার প্রচণ্ড প্রভাব হইতে তাহাকে মুক্তি দেয় নাই। সে জ্ঞানোদয় হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাত্মীয় কোনো পুরুষ কোনো অবলম্বনের সূত্র

> ধরিয়া কখনো তাহাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় নাই – তাহার মাতা অথবা অন্য কোনো নারীর সহিত বাক্যালাপ করা তো অতি দূরের কথা।[১২]

অন্যদিকে আলী খ্রিস্টান তরুণী হেনাকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও রক্ষণশীল পারিবারিক পরিবেশে তাকে স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে দেবকুমার আমেরিকা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশে এসে বাঙালি নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে বলেছে, "একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিত মেয়েতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। সবাই যেন সেই মান্ধাতা আমলের মিনমিনে বেড়ালটি – জবুথবু। গতি নেই – প্রাণ নেই।"[১৩] পুরুষতান্ত্রিকতার যে শিক্ষা তার চেতনায় মিশে আছে, পাশ্চাত্যের উদার পরিবেশেও সে তা ভুলতে পারেনি। তাই সুশিক্ষিতা সুমিত্রার সামনে সে বাঙালি নারীকে তাচ্ছিল্য করতে লজ্জাবোধ করেনি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে নাগরিক সমাজে পরিদৃষ্ট বহুবিবাহ, বহুগামিতা এবং নারী-অবমাননার বিষয়টি বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। *মনের ময়ূর* উপন্যাসে বংশ রক্ষার নামে আলীকে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়া হয়। রুবি বিয়ের খবর জানার পরে আলী তাকে বলেছে, "বাপ-মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে এ বিয়েতে আমাকে মত দিতে হয়েছে।"[১৪] রুবির নারীহৃদয় ব্যথিত হলেও 'অদৃষ্টের লিখন' বলে সে এ বিয়ে মেনে নিয়েছে। এ উপন্যাসে দোয়ারকা সাউয়ের 'সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী' স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকে পিয়ারী নামক এক স্থূলকায়, মেদবহুল নারীকে রক্ষিতা রাখতে দেখা যায়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে মাহমুদা আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনা সেকালের রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে নারীর অসহায়ত্বের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিকতার যাতাকলে পিষ্ট হিন্দু পরিবারের বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীর মনোবেদনা ও নিঃসঙ্গতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে 'মনের ময়ূর' উপন্যাসের বড়দি ও রাধা চরিত্রে।

গ্রাম থেকে শিক্ষা ও জীবিকার সন্ধানে শহরে গিয়ে মানুষ এক সময় শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়, তখন গ্রামে ফিরে তার মন টেকে না। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদের মধ্যে এ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সে মায়ের চিঠি পেয়ে গ্রামে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। লেখক বলেন, "পল্লীর বাটীতে দীর্ঘ প্রাতঃকাল– দীর্ঘতর দুপুর– দীর্ঘতম সন্ধ্যা। ... কিন্তু নাগরিক জীবনে কোথা দিয়া যে সন্ধ্যা আসিত তাহা সে নিজেই অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।"[১৫] অথচ মালবিকার সাথে সিনেমা দেখতে গিয়ে পকেটে টাকা না থাকায় এই ফরিদই হীনম্মন্যতায় ভোগে। নগরের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত-জীবনে সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটে না বলে ছোট ছোট পরাজয় মেনে নিতে হয়; আর এ ধরনের পরাজয় থেকে জন্ম নেয় হীনম্মন্যতা। 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে দরিদ্র হেনার মধ্যেও এ ধরনের হীনম্মন্যতা লক্ষণীয়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯২২ সালে তুরস্কে খিলাফতের পতন পৃথিবীর অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। দুটি ঘটনা বাংলার প্রগতিশীল মানুষকেও নাড়া দেয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলাদেশের তরুণ-মানসে সমাজতান্ত্রিক

আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। সমাজতন্ত্র এবং তার বাস্তব প্রয়োগকর্তা লেনিন (১৮৭০–১৯২৪) যেমন প্রগতিশীল বহু মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন, তেমনি কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১–১৯৩৮) ও তাঁর নব্য তুরস্ক মুক্তমনা মুসলিম তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৬] বন্দে আলী মিয়ার 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে সমকালীন প্রভাববিস্তারকারী ঘটনা দুটি উঠে এসেছে। ফরিদ ও মালবিকা উভয়ই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তারা সবকিছু যুক্তি দ্বারা বিচার-বিবেচনা করে। ফরিদ আগ্রহভরে লেনিনের জীবন-চরিত পড়ে, আবার রক্ষণশীল তুরস্কের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে ফরিদ ও মালবিকা উচ্ছ্বাস ভরে পরস্পর আলোচনা করে।

৪. ধর্ম

বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম লেখকগণ যুক্তিতর্কের আলোকে সমাজের জন্য অকল্যাণকর কিছু বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন।[১৭] এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া (১৮৮০–১৯৩২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) এবং ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের লেখকবৃন্দ ছিলেন অগ্রগণ্য। বন্দে আলী মিয়াও ধর্ম বিষয়ে মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদের মধ্যে তাঁর ধর্ম ভাবনার পরিচয় মেলে, "সে যদিও ধর্ম জিনিসটাকে নিজের জীবনে একেবারেই আমল দেয় নাই, কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাহাদিগকে সে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু যাহারা মুখোশ পরিয়া ধর্মের ভান করিয়া বেড়াইত তাহাদের প্রতি একটু অবজ্ঞা সে সর্বদা পোষণ করিত।"[১৮] 'মনের ময়ূর' উপন্যাসের আলী ধর্ম বিশ্বাস করে, কিন্তু গোঁড়ামিকে বিশ্বাস করে না। সেও ধার্মিকদের শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ধর্মীয় বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করে না। বন্দে আলী মিয়ার নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসের নারীদেরকেও কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে দেখা যায় না।

ধর্ম ভাবনার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম যেমন উদার ও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, বন্দে আলী মিয়াও তেমনি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনে ধর্ম বিষয়ে সহনশীল ও সমন্বয়বাদী জীবন-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতায় এক খ্রিস্টান নারীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৯] তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক দুটি উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের এই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। ঔপন্যাসিকের দুই নায়ক ফরিদ ও আলী ধর্ম বিষয়ে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়ে দুই খ্রিস্টান তরুণীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তবে তাঁর নায়কদ্বয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও তারুণ্যের অভিঘাতে আন্তঃধর্ম বিবাহ করলেও সংসারধর্ম পালনের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা এবং নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছে।

বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে নায়ক-নায়িকার ধর্মবিশ্বাস ইসলাম, হিন্দু, বা খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শ থেকে খানিকটা আলাদা মনে হয়। এ ধর্মের মৌলিক উপাদান সত্যানুসন্ধান, অহিংসা আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এজন্য ঔপন্যাসিকের নায়ক-নায়িকাদের কোন ধর্মের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখা যায়নি। হিন্দু,

মুসলমান, খ্রিস্টান– তিন সম্প্রদায়ের প্রধান নরনারীরা প্রচলিত ধর্মের উপরে মানবধর্মকে স্থান দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে রঘুপতির উক্তিটি স্মরণযোগ্য–

> "... মানুষের সামাজিক বিধানে আমি অপরাধী, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি নির্দোষ। মানবতাকে আমি সম্মান দিয়েছি। ছেলেটি মুসলমানের অথবা অপর কোনো ধর্মাবলম্বীর এ বিচার আমি করিনি। পুত্রের মতো স্নেহে তাকে লালন পালন করেছি।"[২০]

ধর্ম পরিবর্তন বিষয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে আনা হয়েছে। উনিশ-বিশ শতকে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতো, তারা ছিল প্রধানত অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষ। মিশনারিরা যিশুখ্রিস্টের মাহাত্ম্য দিয়ে নয়; দারিদ্র্য ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এ দেশীয় লোকদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতো। ধর্মান্তরিত কোন খ্রিস্টান কোন কারণে সেই ধর্ম ত্যাগ করলে মিশনারিরা কৌশলে শাস্তি দিয়ে ধর্মান্তর ঠেকানোর চেষ্টা করতো। উপন্যাসে আলীকে শাস্তি দেয়ার প্রচেষ্টায় মিশনারি মেমকে বলতে শোনা যায়, "সেই শয়তানকে শাস্তি না দিলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন। সে তোমাকে কি প্রলোভন দিয়েছিলো, বলো?"[২১] হেনার দায়িত্বশীল ভূমিকায় এই অপচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেলেও মিশন থেকে হেনাদের সাহায্য দেয়া বন্ধ হয়ে যায়।

৫. শিক্ষা

বিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চেতনা এবং জাগতিক মুক্তির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে তারা মাতৃভাষা বাংলা এবং রাজভাষা ইংরেজি শেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।[২২] মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০–১৯২৩) 'গরিবের মেয়ে' (১৯২৩), কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২–১৯২৬) 'আবদুল্লাহ' (১৯৩২), আবুল ফজলের (১৯০৩–১৯৮৩) 'চৌচির' (১৯৩৪) প্রভৃতি উপন্যাসে তৎকালীন মুসলমানদের শিক্ষা সচেতনতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ সময়ে বন্দে আলী মিয়াও উপলব্ধি করেন যে, শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এজন্য দরকার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা। তাই তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসের নায়কদের নগরে গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমাজনেতাদের আন্দোলন, সরকারি নীতি এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার উন্নতি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখে।[২৩] এ সময়ে গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারের সন্তানেরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নগরে যেতে থাকে। ফলে উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দু সমাজে যেমন শিক্ষার প্রসার ঘটে, তেমনি বিশ শতকে বাঙালি মুসলিম সমাজে তা প্রসার লাভ করে, এমনকি নারীশিক্ষাও বিকশিত হতে থাকে।'[২৪] নিম্নবিত্তের শিক্ষা সচেতনতার এই দিক 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে উঠে এসেছে। নায়ক ফরিদ কৃষিভিত্তিক মুসলিম পরিবার থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য নগরে এসে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। লেখক বলেন:

> মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া লোকে কার্যে অগ্রসর হইলে তাহা এক সময়ে সম্পন্ন হইয়া যায়। ফরিদ চাহিয়া চিন্তিয়া ধার কর্জ করিয়া কলিকাতায় যাইয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইয়া

> গেল এবং চেষ্টা করিয়া সকাল সন্ধ্যা দুইটা টিউশনি যোগাড় করিয়া লইয়া নিজের খরচ চালাইয়া অতিকষ্টে তাহার মধ্য হইতেও মাতাকে কিছু কিছু করিয়া পাঠাইতে লাগিল।[২৫]

এই উপন্যাসে দেখা যায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ফরিদ আইএসসি পাস করে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়ে। অন্যদিকে 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে দেশভাগের পরে অজয় বিএসসি পাস করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। আর দীপক মেট্রিক পাস করে জেলা সদরে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে লেখাপড়া করে।

'মনের ময়ূর' উপন্যাসেও দেশ বিভাগপূর্ব কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। উপন্যাসে দেখা যায় একই বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শাখায় আলাদাভাবে পাঠদান করা হয়। মেয়েদের শাখায় কেবল শিক্ষিকাদের পড়াতে দেখা যায়। কয়েক দিনের জন্যে ছুটি হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের ফুলের মালা ও নানা রকম খাবার দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যেসব বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থী অধিক, সেগুলো শুক্রবার সকালে বসে। লেখাপড়ায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম আগ্রহ দেখা যায়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে দেখা যায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা একসাথে এক কক্ষে শিক্ষালাভ করলেও ছেলেতে-মেয়েতে কথাবার্তা চলে না। ক্লাস শেষে মেয়েরা শিক্ষকের পিছনে পিছনে বেরিয়ে যায়।

দেশ বিভাগোত্তর কালের পটভূমিতে রচিত 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে মুসলিম পরিবারের মেয়েদের চেয়ে হিন্দু ও খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে স্বল্প পরিসরে হলেও নগরকেন্দ্রিক কিছু প্রগতিশীল মুসলিম অভিভাবক তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। তখনকার মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার এদিক প্রতিফলিত হয়েছে 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে; সেখানে আলীর শ্যালিকা মিতা ও সীমা কলকাতার 'লী মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে' শিক্ষালাভ করে। দেশবিভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক নগরজীবনে 'অবরোধ প্রথার কড়াকড়ি হ্রাস এবং আংশিক অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের'[২৬] দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে নারীরা বেশ খানিকটা এগিয়ে আসে। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মতো মুসলিম পরিবারের মেয়েদেরকেও কলেজে পড়ার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা করতে দেখা যায়।

'মনের ময়ূর' উপন্যাসে শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পারিক সদ্ভাব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক যেমন দেখা যায়, তেমনি বিদ্বেষভাবের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে আলীকে একটি স্কুল ছেড়েও আসতে হয়। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, তবে তাদের কারো কারো মধ্যে কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আলীর জবানিতে শিক্ষকদের সেই মানসিকতা ফুটে উঠেছে– "পরদিন প্রায় পৌনে বারোটায় স্কুলে হাজির হয়ে এ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারে নাম সহি করে উপস্থিতির সময় লিখলুম দশটা পঁয়ত্রিশ। এই যে এক ঘণ্টা দশ মিনিট সময় পিছিয়ে দিয়ে লেখা হলো, এটাকে আমরা দোষণীয় মনে করি না।"[২৭]

এ দেশে শিক্ষাবিস্তারে জমিদার ও বিদ্যোৎসাহী ধনীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসেও সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশীয় জমিদার ও বিদ্যোৎসাহী

ধনীরা বাংলায় শিক্ষাবিস্তারে অবদান রেখেছেন, বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে তার ইঙ্গিত মেলে। 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে সেন জমিদারদের একটি বিশাল বাড়ির একপাশে ছেলেদের, অন্যপাশে মেয়েদের স্কুল বসে। আবার সংস্কৃতিমনা শিক্ষিত লোকদের স্কুল পরিচালনায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে দেখা যায় দেশবিভাগের পরে জমিদার আলীরেজা পূর্ব বাংলার নিজ জমিদারি এলাকায় শিক্ষাবিস্তারে স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. সংস্কৃতি

বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মান্ধ মোল্লারা সংগীত এবং চিত্রকলা চর্চায় ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতো। ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৮), কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল ফজল প্রমুখ সাহিত্যিক মুসলমানদের সংগীত ও চিত্রকলা চর্চার পক্ষে জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করেন। মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'সমস্যা ও সমাধান' (১৯২৮) প্রবন্ধে বিভিন্ন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ধর্মে সংগীতচর্চা কোনভাবেই অবৈধ নয়।[২৮] বন্দে আলী মিয়া নিজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের সমকালে গীতিকার হিসেবে দুই বাংলায় পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের সংগীত ও চিত্রকলা চর্চায় অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এজন্য 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে দেখা যায় তাঁর মানসপুত্র আলী ধর্মান্ধদের বিরূপতার কথা না ভেবে গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য গান লেখে, নিজস্ব দল গঠন করে নাটিকা রেকর্ড করে; পাশাপাশি নিজে চিত্রবিদ্যা চর্চা করে এবং স্কুলের শিক্ষার্থীদের তা শেখায়।

বিশ শতকের গোড়া থেকে মুসলমানদের জাতীয়তাবোধ ও ধর্মচর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাদের মধ্যে পোশাকে ভিন্নতা আনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে বন্দে আলী মিয়া বাঙালি সমাজে পোশাকি স্বাতন্ত্র্যে খুব আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা তাঁর নগরভিত্তিক উপন্যাসের নায়কেরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। বাইরে যাওয়ার সময় তাদের গলায় খদ্দেরের মোটা চাদর ভাঁজ করে রাখতে দেখা যায়। তারা তথাকথিত 'আশরাফ' হয়েও হিন্দু ও খ্রিস্টান পরিবারে খাবার গ্রহণের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা প্রদর্শন করে না। তাই দেখা যায় কোনারকে আগন্তুক ফরিদ মালবিকার এনে দেয়া ভাত "মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে খাইতে বসিল।"[২৯]

বিশ শতকের কলকাতা বাংলার তো বটেই, সমগ্র ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। ব্রিটিশ শাসনের প্রায় পুরো সময় জুড়েই কলকাতা বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিতে আধিপত্য বজায় রাখে।[৩০] বন্দে আলী মিয়ার কলকাতাকেন্দ্রিক দুটি উপন্যাসেই কলকাতার আলোকিত এ দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের হিন্দু ও খ্রিস্টান সমাজের নাগরিকগণ ইতিবাচক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীসহ তরুণ-তরুণীরা পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা করে। 'মনের ময়ূর'

উপন্যাসে প্রতিষ্ঠানের বাইরে মদন সেনের বাড়িতে পারিবারিক আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালিত হতে দেখা যায়।

বিশ শতকের গোড়া থেকে গ্রামোফোনের এবং ত্রিশের দশক থেকে সিনেমার যাত্রা শুরু হয়।[৩১] বিনোদনের এ দুটি মাধ্যম অল্প সময়ের ব্যবধানে তরুণ-তরুণী এবং শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন বাঙালির কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ছায়াছবি দেখে। 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে একটি বিষয় লক্ষণীয়, মুসলিম শ্রোতাদের লক্ষ্য করে ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে রেকর্ডকৃত নাটকে কণ্ঠ দেয় হিন্দু ও খ্রিস্টান শিল্পীরা – যা তৎকালে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার বিষয়টি তুলে ধরে।

বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে দেশীয় খ্রিস্টানদের কাছে ধর্ম স্রেফ বিশ্বাসের ব্যাপার; সংস্কৃতির একটি অংশ মাত্র। তাদের প্রাত্যহিক জীবন আবর্তিত হয় বৃহত্তর বাঙালি সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। তাদের খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, আচার-আচরণ প্রভৃতি বাঙালি সংস্কৃতি অনুসরণ করে। হেনা ও মালবিকার পরিবারদ্বয় ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের অনুকরণে ইউরোপীয় নাম গ্রহণ না করে বাঙালি নাম গ্রহণ করে। লক্ষণীয় বিষয়, মালবিকার পূর্বপুরুষ বর্ণহিন্দু 'মিত্র' থেকে খ্রিস্টান হওয়ায় পদবি পর্যন্ত রেখে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মালবিকা বলেছে, "কোন পুরুষ যে ক্রীশ্চান হয়েছিলেন সে আমি জানিনে, ঠাকুদ্দারা জানতেন কিনা সন্দেহ, আমাদের যিশু তো এ দেশের লোকই নন, সেই দেশের অনুসারে নামকরণ তাঁরা করলেই পারতেন। এমন কি উপাধি পর্যন্ত বদলাননি।"[৩২]

দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বাড়তে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে আস্থা হারিয়ে বাঙালি তার সভ্যতা-সংস্কৃতির শেকড় সন্ধানে এক নতুন যাত্রা শুরু করে।[৩৩] 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে ঢাকাকেন্দ্রিক নবধারার এই সংস্কৃতি চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। মেডিকেল কলেজে বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে খ্যাতিমান গায়ক, গায়িকা, নৃত্যাশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হন। লেখক বলেন– "অনুষ্ঠান চলছিল। রকীবুল ইসলামের একক অভিনয়, তারপর অরুণা সেন ও বীণা দাসের নৃত্য– আফরোজা ও দিলরুবা বেগমের কোরাস সঙ্গীত, ফরিদুল ইসলামের মূক অঙ্গভঙ্গী, শেফালী সেনগুপ্তার কণ্ঠ সঙ্গীত ... ।"[৩৪] এ উপন্যাসে নায়িকা সুমিত্রাকে রবীন্দ্র সংগীত চর্চা করতে দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিরুদ্ধ পরিবেশে সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের জন্ম দেয়– 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের এ দিক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ফরিদ খ্রিস্টান তরুণী মালবিকাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। তখন ধর্ম কোন বাধা না হলেও শিশুকন্যার নাম রাখার সময় বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি নামের পরিবর্তে মুসলিম রীতি অনুযায়ী শিশুকন্যার নাম রাখার পক্ষে ফরিদ নানা যুক্তি তুলে ধরে। এতে ব্যথিত হয়ে মালবিকা ভাবে– "পাঁচ ছয় বছর পরে খুকি যখন বড় হইয়া ইস্কুলে পড়িতে থাকিবে, – তখন তাহার নাম লতিকা মিত্র হইবে, না লতিফা খাতুন হইবে– ইহাই মস্ত বড়ো সমস্যা।"[৩৫] এরপর

এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়, যে মালবিকা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতো, সে-ই গীর্জায় যাওয়া শুরু করে। একদিন যিশুর ক্রুশবিদ্ধ একটি ছবি ঘরের দেয়ালে টানিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ফরিদও একদিন লুঙ্গি পরে কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে যায়। আরেক দিন বোরাকের ছবি এনে যিশুর ছবির পাশে ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা দুজনের মধ্যে ব্যবধানের দেয়াল তুলতে থাকে।

৭. মানবসম্পর্ক

বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসে বিধৃত নাগরিক সমাজে মানবসম্পর্কের বিচিত্র রূপ লক্ষ করা যায়। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে দেশবিভাগপূর্ব কলকাতার আধুনিক পরিবেশেও উচ্চবর্ণের হিন্দু ও ধনী খ্রিস্টানদের মধ্যে বর্ণবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। ফরিদ সাদামাটা ও মুসলমান বলে মালবিকার ভাই তাকে অবজ্ঞা করেছে। আলীর 'কবি' পরিচয় ছাপিয়ে 'মুসলমান' পরিচয় বড় মনে করে শ্যামলী তাকে ছেড়ে গেছে। বিভাগপরবর্তী কালে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ ও নগর জীবনভিত্তিক উপন্যাসেও বর্ণবাদ ও জাতপাতের প্রসঙ্গ এসেছে। 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে আলীরেজার উক্তিতে বিষয়টি প্রকাশ পায়, "... তারা যখন জানতে পারবে, রঘুপতিবাবু আপনার গৃহে একটি মুসলমান সন্তানকে পালন করেছেন, তারা নিশ্চয়ই বিশেষ তৎপর হয়ে শাস্তি প্রদানের কঠোর হস্ত উদ্যত করবে।"[৩৬] তবে নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলোর প্রধান পাত্রপাত্রী এবং সাধারণ খ্রিস্টান, মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের বাছবিচার প্রকট নয়।

বন্দে আলী মিয়ার নগরকেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাসে প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে ফরিদ-মালবিকার প্রেম এবং 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে আলী-হেনার প্রেম পরিবারে বাধাপ্রাপ্ত এবং সমাজে নিন্দিত। তবে উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বময়ী দুই নারীর বলিষ্ঠ ভূমিকা সকল বাধা অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে। ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য এরা যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত; হেনার উক্তিতে তার সমর্থন মেলে, 'ধর্মের জন্য ধর্ম ত্যাগ করিনি– শুধু তোমার জন্যেই করেছি।'[৩৭] 'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে বৈদ্য অজয় এবং ব্রাহ্মণ সুমিত্রার অসবর্ণ ভালোবাসা উভয় পরিবারে স্বীকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে উভয়ের শিক্ষা, পারিবারিক আবহ এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। তবে প্রেমের সাধনায় পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক সক্রিয়, বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল।

সপত্নীবাদের ভিন্ন দুই মাত্রা পরিলক্ষিত হয় 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে। আলীর দ্বিতীয়া স্ত্রী শামীম সতীন রুবির জন্য স্বার্থত্যাগ করে। তার ভাষ্য, "আপনি এসেছেন আগে – আমি এসেছি পরে। আপনার সংসারে আশ্রিতের মতো আমাকে স্থান দেবেন। আমি আপনার ছোট বোনের মতো থেকে যেন সেবা করে যেতে পারি।"[৩৮] রুবিও ধীরে ধীরে শামীমকে আপন করে নেয়। কিন্তু আলী ও হেনার গোপন বিয়ের কথা প্রকাশ পেলে তারা উভয়ে আলীর প্রতি যতটা অসন্তুষ্ট হয়, তার অধিক ক্ষুব্ধ হয় হেনার উপরে। আলীর স্বীকারোক্তি, "উভয়ে সম্মিলিতভাবে হেনার বিরুদ্ধে রণে অবতীর্ণ হলো।"[৩৯] অর্থাৎ রুবি ও শামীম একে অপরকে সতীন হিসেবে মেনে নিলেও কলকাতার ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন সংস্কৃতির আরেক নারী হেনাকে মেনে নিতে পারে না।

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলেজে সহপাঠী তরুণ-তরুণী একে অপরের সঙ্গে কথা বললে নিন্দনীয় মনে করা হতো– 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসে এটি প্রতিফলিত হয়েছে। ক্লাসে সহপাঠী মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় মালবিকা অকস্মাৎ ফরিদকে দেখে আনন্দিত হলেও তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। কারণ "সহসা ইহাকে বাদ দিয়া সে যদি পুরুষ-প্রীতি দেখায় তবে তাহার ভাগ্যে কিরূপ লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবী এবং এমন কি কলেজসুদ্ধ মেয়ের বিদ্রুপ-টিটকারি তাহার উপরে বর্ষিত হইতে থাকিবে, তাহা নিমেষে কল্পনা করিতে তাহাকে আটকাইল না।"[৪০] ফরিদ ও মালবিকার ভালোবাসা জানাজানি হয়ে গেলে সহপাঠীরা নানাভাবে বিদ্রুপ করতে থাকে। এক্ষেত্রে নারী বলে ফরিদের চেয়ে মালবিকাকে অধিক লাঞ্ছনা সইতে হয়।

'অরণ্য গোধূলি' উপন্যাসে মানবসম্পর্কের এক জটিল রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। আত্মপরিচয় সংকটে ভুগতে থাকা অজয় এক সময় নতুন পরিচয় পায়; জানতে পারে হিন্দুর ঘরে লালিত হলেও সে জন্মসূত্রে মুসলমান। অজয়ের স্বীকারোক্তি, "এতকাল ছিলাম হিন্দু – এখন ঘুম ভেঙে দেখতে পাচ্ছি ভাগ্যচক্রে আমি মুসলমান।"[৪১] এরপর অজয়কে ঘিরে হিন্দু অনুরাধা ও মুসলমান আফরোজার পুত্রস্নেহ একবিন্দুতে মিলিত হয়। কেননা মাতৃস্নেহের কোন জাত থাকে না। এভাবে হিন্দু-মুসলমান পরিচয় ছাপিয়ে অজয়ের 'মানুষ' পরিচয় বড় হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটতে থাকলে ব্রিটিশ বাংলায় অর্থনৈতিক সুযোগকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা মুসলামনদের জন্য রাজনীতি হয়ে ওঠে শক্তিশালী অস্ত্র।[৪২] সম্প্রদায়গত স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনীতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এ সময় সমাজের প্রায় সর্বত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছাপ পড়ে, কিন্তু বন্দে আলী মিয়ার নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক জীবন অনেকাংশে অনালোকিত থেকে গেছে। তিনি নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে সময়ের ঘোলাজলের স্রোতকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেছেন।[৪৩]

৮. উপসংহার

বন্দে আলী মিয়ার নগরভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে প্রধানত বিশ শতকের প্রথমার্ধের নগরজীবনের প্রাত্যহিকতা, পেশাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পুরুষপ্রধান একক ও যৌথ পরিবারপ্রথা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা, নারীভাবনা, ধর্মাচরণ এবং মানবসম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর প্রধান পাত্রপাত্রীরা পারস্পারিক সহাবস্থান এবং সমন্বয়বাদী জীবনচেতনায় বিশ্বাসী। অবশ্য ঔপন্যাসিক তখনকার কলকাতা ও ঢাকা নগরের যে নাগরিক জীবনচিত্র এঁকেছেন, তা অনেকখানি গ্রামঘেঁষা। ঔপন্যাসিক দীর্ঘদিন নগরে বাস করেছেন, কিন্তু নাগরিক জীবনধারাকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি বলে মনে হয়। সেটি তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না; কেননা তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা পাবনা শহরের উপকণ্ঠে গ্রামীণ পরিবেশে – যেখানে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব বেশি ছিল। ফলে তাঁর মানস সেভাবে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে গত শতকের বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কলকাতা এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ঢাকা তখনো আধুনিক

মহানগর হয়ে ওঠেনি। এজন্য ঔপন্যাসিকের নাগরিক চরিত্রগুলো উপন্যাসে পরিপূর্ণ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে না। তবে তাঁর উপন্যাসে নগরজীবন আরোপিত রূপে বা কৃত্রিমভাবে নয়; বরং স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে। ঔপন্যাসিক তাঁর নগরভিত্তিক উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে সমকালীন নগরজীবন অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন। বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে দেশবিভাগ-পরবর্তী কালের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিকাশমান জনগোষ্ঠীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে তিনি নগরজীবনকে দেখতে চেয়েছেন; একটি বিশেষ কালের চলমান জীবন-বাস্তবতা রূপায়ণের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূচি:

---

[১] মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, *বন্দে আলী মিয়ার জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: মম প্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ১০৮

[২] মানসুর আল ফারুকী, "অন্তরঙ্গ আলোকে কবি বন্দে আলী মিয়া," অন্তর্গত, শফিকুল আলম শিবলী ও মোঃ হাবিবুল্লাহ, সম্পা., *বন্দে আলী মিয়া জন্ম শতবর্ষ স্মারক* (পাবনা: বন্দে আলী মিয়া স্মরণ পরিষদ, ২০০৫), পৃ. ২২

[৩] এম আবদুল আলীম, *সবুজপত্র ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৯), পৃ. ১৫৮

[৪] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৪

[৫] বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (বুক ক্লাব, ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৬১

[৬] বন্দে আলী মিয়া, 'মনের ময়ূর,' *বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ১৮৬। অতঃপর খণ্ডসংখ্যাসহ 'বআমির' নামে উল্লিখিত।

[৭] শরীফ উদ্দিন আহমেদ, "নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী," অন্তর্গত, সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২০৪

[৮] 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৩৯৩

[৯] 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৫০

[১০] শরীফ উদ্দিন আহমেদ, "নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী," অন্তর্গত, সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৯৮

[১১] গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫৬

[১২] 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৮১

[১৩] 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৪৩০

[১৪] 'মনের ময়ূর,' *বআমির* ২, পৃ. ১৬১

[১৫] 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৫৬

[১৬] স্বরোচিষ সরকার, বিশ শতকের মুক্তচিন্তা (ঢাকা: অবসর, ২০০৮), পৃ. ২৪

[১৭] স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা: মুসলমান সমাজ* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ৯৮

[১৮] 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৮৭

[১৯] মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, "কবি বন্দে আলী স্মরণে" অন্তর্গত, গোলাম সাকলায়েন, সম্পা., *কবি বন্দে আলী মিয়া স্মারক গ্রন্থ* (রাজশাহী: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৩

[২০] 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৪৪৮

[২১] 'মনের ময়ূর,' *বআমির* ২, পৃ. ১৮৯

২২ স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা মুসলমান সমাজ* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১২৭
২৩ আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৩), পৃ. ৯৩
২৪ গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫৭
২৫ 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৭৯
২৬ গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ২৫৬
২৭ 'মনের ময়ূর,' *বআমির* ২, পৃ. ২১৮
২৮ স্বরোচিষ সরকার, *বাংলা সাহিত্যে সংস্কার চেতনা মুসলমান সমাজ* (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৪৪
২৯ 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ২৫
৩০ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, "নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী," অন্তর্গত, সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২০৩
৩১ গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬), পৃ. ১৫৭
৩২ 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৭৬
৩৩ সিরাজুল ইসলাম, "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট," অন্তর্গত, সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ২৩
৩৪ 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৪০৪
৩৫ 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ৭৮
৩৬ 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৪৪৮
৩৭ 'মনের ময়ূর,' *বআমির* ২, পৃ. ১৮৪
৩৮ তদেব পৃ. ১৬৩
৩৯ 'মনের ময়ূর,' *বআমির* ২, পৃ. ১৮৮
৪০ 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে,' *বআমির* ২, পৃ. ২৭
৪১ 'অরণ্য গোধূলি,' *বআমির* ২, পৃ. ৪৫০
৪২ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, "নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী," অন্তর্গত, সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ২০৩
৪৩ আজহারউদ্দীন খান, "বন্দে আলী মিয়া ও বাংলা সাহিত্য," অন্তর্গত, গোলাম সাকলায়েন, সম্পা., *কবি বন্দে আলী মিয়া স্মারক গ্রন্থ* (রাজশাহী: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৭